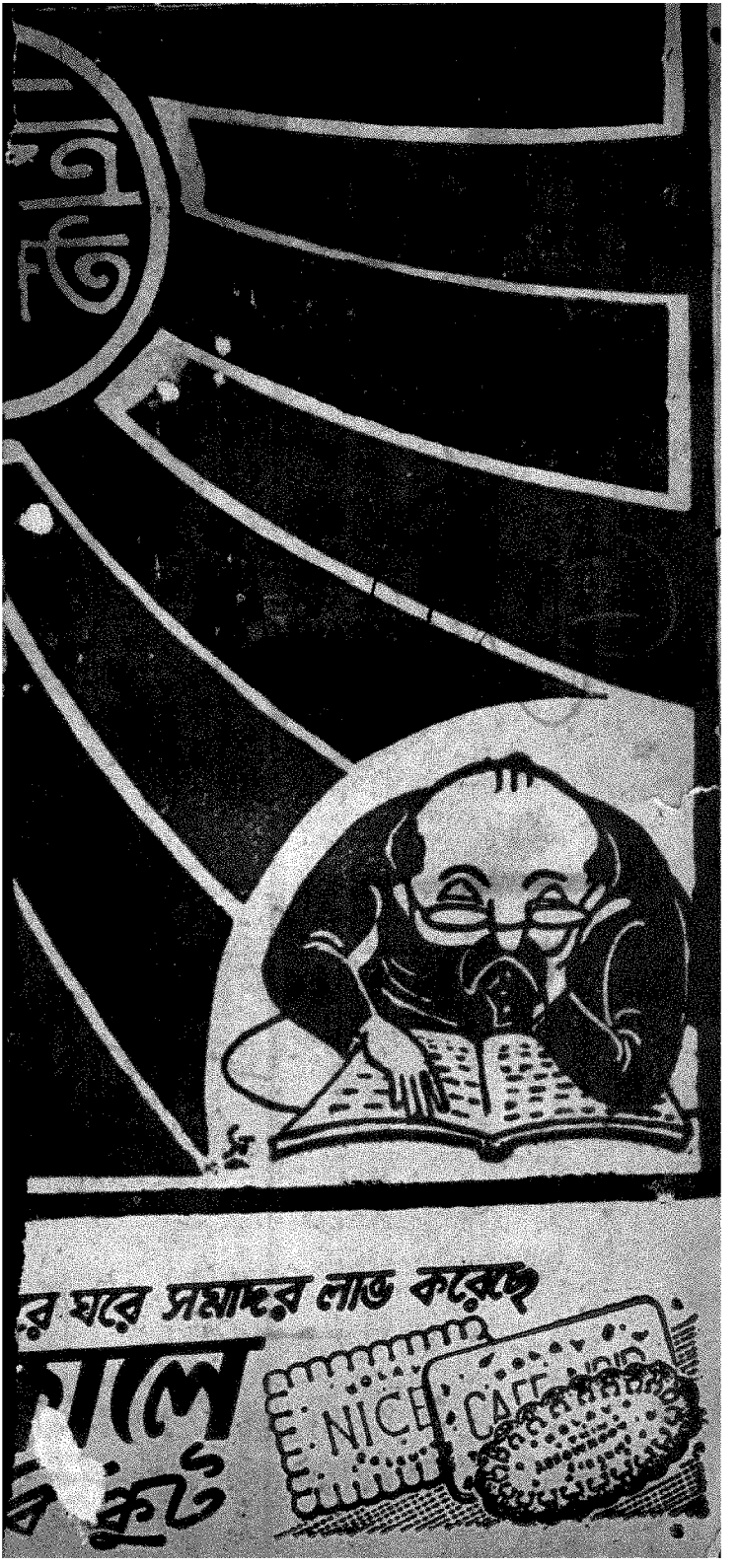
ঘরে সমাদর লাভ করেছে
NICE CAFE

বোরোলীন

প্রসাধনে অতুলনীয়!

মুখমণ্ডলের কান্তি এবং লাবণ্য রক্ষা করা যখন কঠিন হয়··· বায়বিক পরিবর্তনে যখন ত্বক ও ওষ্ঠাধর শুষ্কতর হয়ে ওঠে, তখনই মনে পড়ে বোরোলীন-এর কথা। লানোলীন-যুক্ত আণ্টিসেপ্টিক বোরোলীন যে শুধু শুষ্ক ত্বককে লাবণ্যময় এবং মসৃণ করে তোলে, তাই নয়··· এর মৃদু সুগন্ধ মনকে করে বিমুগ্ধ।

নিত্য প্রসাধনে বোরোলীন ব্যবহার করুন।

জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাইভেট লিঃ

১১/১, নিবেদিতা লেন, কলিকাতা-

সচিত্র ভারত

P 36,147

[Vol, XXVI] ৮ই বৈশাখ শনিবার '৬৯ 21st April '62 [২য় সংখ্যা

গো, কিছু কিনবো না শুধু ডিজাইনটা দেখে চলে আসবো।

ধুলো ০

মনিব বলিলেন ভৃত্যকে : 'স্তাখ তো এই চেয়ারটার ওপর কত ধুলো পড়ে আছে। তোর চোখে পড়ে না ?'

ভৃত্য বলিল : 'আজ্ঞে অনেক দিন এ চেয়ারের ওপর কেউ বসে নি কিনা। তাই অত ধুলো পড়েছে।'

শান্তিবাদী ০

কান্তিকুমার বলিল 'পৃথিবীতে যদি যুদ্ধ না থাকত তা হলে আমি সব চেয়ে বেশি খুশী হতাম।'

রমেশ বাবু ভাগ্নের কথা শুনিয়া খুশী হইলেন। বলিলেন 'তুই বুঝি রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি মহাপুরুষদের মত বাদী ?'

'হ্যাঁ মামা, আমি শান্তিবাদী। যুদ্ধবিগ্রহ বড় অশান্তি হয়। এই পরীক্ষার আগে এতগু ইতিহাস মুখস্থ করা কথা ?'

অনেক লোকের কা

শ্যামবাবু আর রাম বিরাট মাটিকাটা যন্ত্রের দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে যন্ত্রটি বাষ্পের জোরে চ অনায়াসে মাটি কাটিয়া

উঠাইয়া গাড়ির পর গাড়ি ভর্তি করিয়া ফেলে।

শ্যামবাবু বলিলেন 'আহা হা, কোদাল আর পাঁইতি হাতে একশো জন মজুর যে কাজ করে, এই যন্ত্র একাই তাই করে একশো জন লোকের অন্ন মারছে। ভারি অন্যায়, ভারি অন্যায়।'

রাম বাবু বলিলেন 'একশো জন কি বলছেন শ্যামবাবু? কোদাল আর গাইতির বদলে হাতা আর চামচ দিয়ে মাটি তোলালে ঐ একশোর জায়গায় যে কয়েক হাজার লোকের অন্নসংস্থান হতে পারত।'

ডবল উপহার ০

মালতী বলিল 'ভাই, বিয়েতে সঞ্চয়িতা, পথের পাঁচালী, সাহেব-বিবি-গোলাম সব দুখানা করে পেয়েছি। ভাখ তো কি আপদ। একই জিনিষ ডবল পেয়ে কি লাভ?'

'একই গয়না ডবল পেলে লাভ আছে বই কি?'

●

শুনা যাইতেছে আমেরিকার 'লেডিরা' শাড়ী পরিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

আমেরিকান লর্ডগণ এখনও 'কাবুলী মালকোঁচা' দেওয়া শিখিয়া উঠিতে পারেন নাই।

●

সাংবাদিকগণ মনে করেন যে সংবাদ পত্রের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জল।

আপাততঃ গৃহিণীগণ উনুন ধরাইবার সময় উহা লক্ষ্য করিয়াছেন।

●

অনেকে বলেন, আজকালকার ছেলেমেয়েরা কেবল কোর্টশিপ করিতেই চাহে, বিবাহ করিতে চাহে না।

পরে কোর্ট এড়াইবার জন্য।

[—আরতি বসু]

খাপছাড়া যুগ

বাংলার বর্তমান যুগটা বড় খাপছাড়া হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমেই যেন আরো বেশি খাপ ছাড়াইতেছে। এত খাপ যে কি করিয়া ছাড়ায় বুঝিতে পারি না। জানি না এই বৃদ্ধ বয়সে আরো কত কি দেখিতে হইবে।

এক্ষণে বাংলার সরকারী কর্ণধার যিনি তিনি ভারতের সেরা ডাক্তার, এবং খুব জবরদস্ত মানুষ বলিয়া খ্যাত। কিন্তু এই ডাক্তার কর্ণধারেরই আমলে বিভিন্ন হাসপাতালে ডাক্তাররা একাধিকবার যে সব কাণ্ড করিয়াছে তাহা নিম্নশ্রেণীর গুণ্ডাদেরও বোধ হয় লজ্জা দেয়। সম্প্রতি কলিকাতার সেরা সরকারী হাসপাতালে এক শ্রেণীর ডাক্তার (?) এবং ডাক্তারী ছাত্রেরা দুইজন সাংবাদিককে যে ভাবে লাঞ্ছনা ও প্রহার করিয়াছে তাহা সভ্য সমাজে সম্ভব বলিয়া ভাবিতে পারি না। শুনিয়াছি ইহা নাকি 'সরকারী মহলে তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি করে।' হায় সরকার! হায় তীব্র আলোড়ন। ইহার ফল আগেকার মতই হইবে আশংকা করি। অর্থাৎ আলোড়নের পর মৃদু আলোচনা। তারপর একটু অনুসন্ধান (অর্থাৎ 'এনকোয়ারি কমিটি'), তারপর হয় তো একটু মৃদু—অথবা একটু কড়া—

রিপোর্ট। তারপর খতম। অর্থাৎ কাজের কাজ কিছুই না হওয়া। তারপর পুরাতনের পুনরাবৃত্তি। অর্থাৎ ডাক্তারদের অডাক্তারোচিত তাণ্ডব।

কিন্তু কেন এইরূপ হয়? কেন এইরূপ হইতে পারে? কেন আমাদের তথাকথিত সভ্য বাংলার ডাক্তাররা এমন কাণ্ড করেন এবং করিতে ভরসা পান (কারণ এরূপ করিয়াও তাঁহারা পার পাইয়া যান) যাহা খুব সম্ভব আফ্রিকা এবং অন্যান্য স্থানের তথাকথিত অসভ্য বর্ব্বর জাতের বুনো ডাক্তাররা করে না? এই একটি মস্ত বড় "কেন?" ইহার একটা ভাল জবাব চাই।

আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় এই জাতের ডাক্তাররা ভাবেন 'আমাদের খোদ বড়কর্তাই যখন ডাক্তার তখন আর আমাদের পায় কে? আমাদের সাতশো খুনও মাপ হইবে। আমরা যাহাই করি না কেন, আমাদের টিকিটিও কেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না।'

খুব সম্ভব আমার বৃদ্ধ মনে যে সন্দেহ উঁকি দিয়াছে তাহা আরো বহু মনে উঁকি দিয়াছে। ইহা ভারতের সেরা ডাক্তারের পক্ষে বড় গৌরবের কথা নহে, তাহাকে 'দৌহ-মানব' প্রভৃতি বলিয়া যতই চেঁচাই না কেন। আমাদের মহা-ডাক্তার কর্ণধার যদি অন্তত একটি বারও সমব্যবসায়ী প্রীতি ভুলিয়া কঠোর হস্তে এই সব ক্ষুদে ডাক্তারদের কর্ণ ধারণ করিতে পারেন, এই বৃদ্ধের মনে হয় তাহা হইলে কিছু সুফল ফলিত।

কিন্তু হায়! বৃদ্ধ বয়সে বার্দ্ধক্যের ঠেলায় আমার এ কি হইল? এটা আমি বুঝিতেছি না কেন যে এই খাপছাড়া যুগে এ ধরণের আশা করাই বাতুলতা?

খবরের কাগজের সংবাদে প্রকাশ উক্ত ঘটনার নায়ক ডাক্তার ও ডাক্তার-ছাত্রদের 'গুণ্ডাবাজী'কে নানা মহলে 'ধিক্কার' দেওয়া হইয়াছে। ইহা গণ্ডারকে ছুচ ফুঁড়িয়া ইনজেকশন দিবার প্রচেষ্টা মাত্র। গণ্ডারের দাওয়াই আলাদা।

(—শৈ-মো-ব)

স্থূল সত্ত্বা

—দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়

দোকানটার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল বিমল। সাইন বোর্ডের ছবিটা লক্ষ্য করল খুটিয়ে খুটিয়ে। নাক সিটকাল। কি নির্ব্বোধের মত স্থূল কাজ হয়েছে। এমন ছবি আবার কেউ টাঙিয়ে রাখে নাকি? শাড়ীর বিজ্ঞাপন। বসন্তের সমাগম হয়েছে বাগানে। একটি মেয়ের আলতো শাড়ী উড়ছে। কোন নূতনত্ব নেই। একঘেয়ে গতানুগতিক। এই রকম একঘেয়েমিতে আজ ছেয়ে গেছে সমস্ত দেশটা। 'কিছু চাই নাকি স্যার?' একজন দোকান কর্ম্মচারী এসে মুখ বাড়াল।

'না, কিছু চাই না।' বিরক্ত হল বিমল। আমাদের দেশের লোকেরা আজো কি অজ্ঞ—তারা দোকানদার এবং অন্তলোকের মধ্যে জিনিষ কেনা ছাড়া আর কোন সম্পর্কই ভাবতে পারে না।

বিমল আবার হাঁটতে সুরু করল। হাতে তার অফুরন্ত সময়। ভালই হয়েছে চাকরীটা গিয়ে। তার মত বুদ্ধিমান লোকের ঐ সামান্য একটা চাকরী নিয়ে থাকা পোষায় না। অফিসে থাকতে এই দুপুরটাকে সে কোন দিন অনুভব করতে পারে নি। কর্ম্মব্যস্ত ফাইলের চাপে কখন যে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে যায় খেয়ালই থাকে না। আজ সে অনুভব করবে এই অলস মিষ্টি দুপুরটাকে। কালকের দুপুরটা সে ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। আজকের

দুপুরটাকে সে একটু একটু করে অনুভব করবে।

সে ইচ্ছা করলেই এখন অনেক কিছু করতে পারে। বিমল নিজের মনে বলল, 'তুমি এখন যা খুশী তাই করতে পারো বিমল। রিক্সা-ওয়ালাদের সঙ্গে সুখ দুঃখের কথা কইতে পারো, সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্রিকার ষ্টলগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে পারো, রাস্তায় দাঁড়িয়ে খুটিনাটিগুলো দেখতে পারো।'

বিমলের এবার সাহসিকতাপূর্ণ কোন কাজ করবার ইচ্ছা হল। ঐ যে ট্রাম থেকে সুন্দর মেয়েটা নামল ওর সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা করতে পারে সে। আর কি করতে পারে সে। আর কি করতে পারে সে? হঠাৎ বিমলের মনে হল এবার সে মরতে পারে। বীরের মত নির্ভীক ভাবে মরতে পারে। ট্রামের চাকায় দেহটাকে দ্বিখণ্ডিত করতে পারে, ডবল ডেকারের চাকায় নিজেকে পিষ্ট করতে পারে। পরক্ষণেই সে ভাবল এই রকম ভাবে মরাটা আর্টের দিক থেকে বড়ই বেমানান। তার মত একজন প্রথম শ্রেণীর বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে মোটেই উচিৎ কাজ হবে না। যদি ইচ্ছা মৃত্যুর কথা সত্য হত তবে একটু করে মৃত্যুর মধুর স্বাদ গ্রহণ করত, তারপর চলে যেত এই নির্বোধ জগৎ থেকে। অবশ্য বিমলের নিজের ইচ্ছা শক্তির উপর বিশ্বাস আছে। সে চেষ্টা করলে এই রকম ভাবে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে পারে। কিন্তু তাতেও কি নিস্তার আছে? স্থূল বুদ্ধির লোকেরা ভাববে কর্ম্ম চ্যুত এক যুবক হার্ট ফেল করেছে বা বিষপানে আত্মহত্যা করেছে। আসবে সেই সব ইউনিফর্ম পরা নির্বোধ পুলিসের লোকেরা যারা নিজেদের বুদ্ধিমান বলে ভাবে। টানা হেঁচড়া করবে তার মৃত দেহটা। লাশটা আগুনে ঝলসাবার আগে কাটাকুটি করবে অবোধ ডাক্তার-গুলো। তারপর বিজ্ঞের মত মাথা দুলিয়ে গম্ভীর ভাবে মন্তব্য করবে —এ কেস অব···থাক আর ভাববে না সে।

তা ছাড়া মরে লাভই বা কি। আর নিজের কোন ক্ষতি নেই মৃত্যুতে। কিন্তু দেশের ক্ষতি হবে অপুরণীয়। সে একজন প্রথমশ্রেণীর বুদ্ধিমান লোক। এই রকম একজন নাগরিকের মৃত্যুতে যে কোন স্বাধীন দেশের ক্ষতি হবে অপরিসীম।

ভাবতে ভাবতে একজন পথচারী লোকের সঙ্গে ধাক্কা খেল। ভ্রূ-কুঞ্চিত করে চলে গেল লোকটা; রাগ হওয়ার পরিবর্তে হাসি পেল বিমলের। যারা নিজেরা বোকা তারা পৃথিবীর সব লোককে বোকা ভাবে, তাদের দেশের কেষ্ট পাগলের কথা তার মনে পড়ছে। সে আর সকলকে ডাকত পাগল বলে। এমনিই হয়।

বিমলের হঠাৎ খেয়াল হল সে অনেকটা হেঁটেছে। এসপ্ল্যানেডে এসে পড়েছে। এখন সে কি করবে? বিমল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু চিন্তা করল, তারপর মনে মনে বলল, 'আমি এখন খাব, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।' পয়সা যদিও কিছু পকেটে আছে তবুও সেটা খরচ করা এখন উচিত হবে না। বরং পুরানো অফিসটায় ঘুরে এলে হয়, কাছেই যখন এসে পড়েছে। খাওয়াটাও হয়ে যাবে বন্ধুদের পয়সায় এবং তাদের সে দেখিয়ে দিতে পারবে যে, দুদিন আগেও সে যাদের সঙ্গে শীতের মিষ্টি দুপুরটাকে বসে বসে হত্যা করেছে, কুৎসিৎ আলোচনায় মনটাকে করেছে পীড়িত, সে এখন কত স্বাধীন। ভাবতে ভাবতে অফিসের দরজায় এসে পড়ল সে। হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। আচ্ছা অফিস ঘরে না গিয়ে সে যদি সোজা বড় সাহেবের কামরায় গিয়ে ঢোকে কেমন হয়। এখন তো তার আর কোন ভয় নেই আগের মত। এখন সে তার অধীনস্থ কর্মী নয়। সুতরাং গিয়ে যদি বলে, 'মিঃ সেন কেমন আছেন? দেখা করতে এলুম।' বলেই একটা চেয়ার টেনে বসে পড়বে।

মিঃ সেন তার ধৃষ্টতা দেখে কিছুক্ষণ অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবেন তারপর একটা কঠিন কথা বলতে গিয়ে পরমুহূর্তে সামলে নেবেন। কারণ বিমল আর এখন তার অধীনস্থ কেরাণী নয়।

এর পর বিমল পকেট থেকে সস্তা সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে নিজে একটা নিয়ে আর একটা তাকে অফার করবে। যদি তিনি নিতে না চান (না নেওয়াটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক)। তবে সাহেবের কামরায় বিমল ঢুকেই পড়ল।

কিছুক্ষণ পর বিমল নিজেকে আবিষ্কার করল এই অবস্থায়—হাত দুটো যুক্ত, কপালে বিন্দু বিন্দু

অবস্থা মিশ্রিত কঠিন দৃষ্টির সামনে এবং তার মুখ বলছে, 'স্যার এবারের মত ক্ষমা করুন। আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আর ইউনিয়নের কাজ করব না।'

সাহেব গম্ভীর ভাবে বললেন, 'বেশ সই কর এই কাগজে।' সই করল সে।

বিমল রাস্তায় এসে ভাবল তার মত বুদ্ধিমান লোক কখনোই সামান্য একটা চাকরীর জন্য সামান্য বুদ্ধির অধিকারী একজন বাঙালী সাহেবের কাছে মাথা নিচু করতে পারে না। যে করেছে সে অন্য লোক। সে করেছে সে অন্য লোক। সে হচ্ছে তার অন্য সত্তা, স্থূল সত্তা—যে একজন সাধারণ মানুষের মত ক্লান্ত, রক্ত এবং অশ্রুর কাঙাল, অতএব এটা তার মোটেই পরাজয় হয় নি। তার সূক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারী সত্তাটি সাহেবের কাছে গিয়ে ঘুমিয়েছিল, এই ভেবে সে আত্মপ্রসাদ পেল।

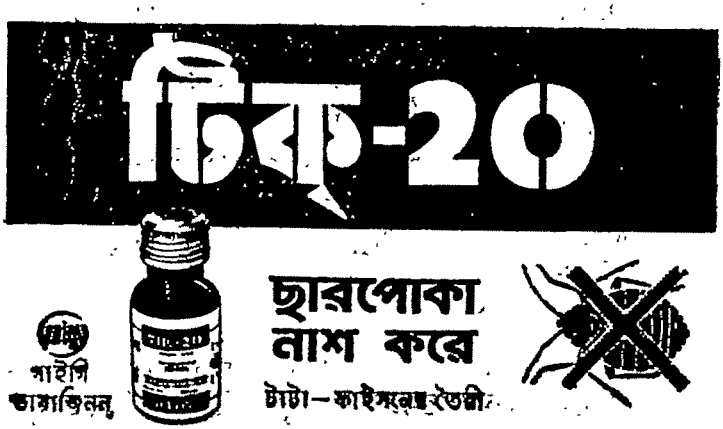

মুখ সুস্থ, স্বচ্ছ ও দুর্গন্ধমুক্ত রাখুন

সাধনা দশন কেবল আমাদের দন্ত মঞ্জন নয়, ইহা বিশেষভাবে মুখ পরিষ্কারের কাজও করে।

নিয়মিত ব্যবহার করিলে ইহা যে দন্তরাজি শুভ্র, মসৃণ ও সুন্দর করে তাহা নহে, মুখ জীবাণুমুক্ত, নির্মল ও প্রীতিকর গন্ধযুক্ত রাখে।

প্রত্যহ ব্যবহার করুন

সাধনা দশন

সাধনা ঔষধালয়—ঢাকা

২০৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

সাধনা ঔষধালয় রোড, আমলা বন্দর

কলিকাতা-৩৮

প্রণেতা—বিশেষজ্ঞবৃন্দ মোঃ, এস্, এ, মুখোপাধ্যায়, এল্, পি, এস্, (লন্ডন) এম্, সি, এস্, (আমেরিকা) ঔষধালয়ের প্রধান পরামর্শ ও তত্ত্বাবধান।

ডাক্তারী সেবা—ডাঃ সুরেশচন্দ্র মোঃ, এম্, বি, বি, এস্, (কলিঃ) মুখোপাধ্যায়।

দিল্লী কা লাড্ডু

—আবু আতাহার

চারিদিকে খাঁ খাঁ রোদ্দুর চাচা।

রাস্তায় গরম পিচ আর পাশের বাড়ির রেডিও থেকে ভেসে আসা একটানা সুরের ক্রন্দন এমনি এক নিঝুম, নীরব দুপুর বেলায় ঘরের ভেতর আমরা কজন। আমি, আশারাফ, অশোক স্বপন আর রহমান। মাদুরের এককোণে বসে আমাদের আসরের মধ্যমণি, আমাদের পরামর্ষদাতা উৎসাহদাতা বুদ্ধিদাতা এবং যে কোন সমস্যার সমাধান করনেওয়ালা পৃথিবীর প্রখ্যাত লোকদের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত অন্যতম গাল্পিক গুলজার

স্বপনের কল্যাণে চাচার আজ লক্ষ্ণৌই তামাক পান করার সৌভাগ্য হয়েছে। তারই খোশবুতে চারিদিক মাৎ। আমেজ লেগেছে মনে, আবেগে ঢুলু ঢুলু নিদ্রালু চোখে গুলজার চাচা টেনে চলেছেন তাঁর নবাবী গড়গড়ে।

সহরের হৈ চৈ কোলাহল এই দুপুরে অনেকটা শান্ত। শুধু মাঝে মাঝে দু একটা মটরের হর্নের আওয়াজ কিংবা ফাঁকা ট্রামের ঘটাং ঘটাং সঙ্গ। সামনের পথ দিয়ে আধ কোটা গোলাপ কুড়ির

মতো কতকগুলো মেয়ে গল্প করতে করতে চলে গেল। তাদের চুড়ির রিনিঝিনি আওয়াজ আমাদের কানে এল না কিন্তু দূর থেকে দেখলাম তাদের উচ্ছল, প্রাণবন্ত চঞ্চল, দোল লাগানো, মন কাঁপনো মধুর হাঁসি। আশারাফ আর অশোক আড় চোখে লক্ষ্য করছিল ওদের। গুলজার চাচা গলায় একটা) অদ্ভুত আওয়াজ করলেন, বললেন গল্প শোন—

ফরিদ নগরের বিখ্যাত সওদাগর কজল আলির একমাত্র পুত্র ফারুক আলি বুদ্ধিতে, গুনে, স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্য্যে ধনে দৌলতে ছিলেন অদ্বিতীয়। সামান্য বাইশ বছর বয়সেই বাপের সঙ্গে ব্যবসা করে বিস্তর সুনাম অর্জ্জন করেছিলেন উনি। কিছুরই অভাব ছিলনা তার দাস দাসি উঠতে বসতে। একজনকে ডাকলে দশজন হাজির হয়। পোলাও কোর্ম্মা, কালিয়া, কোপ্তা, মুরগি মুসাল্লাম, শাহি টুকরা, ফিরনি, সিমাই সব সময় খান তিনি। গফর দুধে স্নান করেন আঙুরের সরবতে কুলকুচি করেন—

—এ আপনার বাড়াবাড়ি চাচা। আপত্তি করল আশারাফ।

—চুপ করে শুনে যা। ধমক দিলেন চাচা। মাঝখান থেকে প্রশ্ন করে কেন যে মুড নষ্ট করিস তাই ভাবি। এ সব খানদানি ব্যাপার যদি বুঝতে কষ্ট হয় কাল থেকে আসিস না।

আমাদের অনুরোধে আবার সুরু করেন গুলজার চাচা।

ফারুক আলি প্রত্যেকদিন বিকেল বেলায় ঘোড়ায় চেপে বেড়াতে বেরোন। হয়তো কখনো চলে যান গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠ পেরিয়ে অনেকদূরে কিংবা সহরের গলিতে গলিতে বাদসাহি সড়কের ধারে ধারে।

সেদিনও এমনি বেরিয়েছিলেন। চলে গেছিলেন পাশের সহরে ঘুরছিলেন সেখানকার পথে পথে। বসন্তের বিকেল ঝিরঝিরিয়ে বাতাস বইছিল পাখির কাকলি, কোকিলের কুহুতান গাছে, গাছে, শাখায়, শাখায় শোনা যাচ্ছিল, সহরের ভেতরেও ফলের আর ফুলের দোকানগুলো কতরকম মরশুমি ফলফুলে ভরে ওঠেছিল। ফারুক আলির ঘোড়া ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছিল। ঠিক এমন

তর্জনে বাঙালী

সময় একটা ছাদে দৃষ্টি যেয়ে ঠোক্কর খেল তাঁর ক্ষণিক দ্যাগ্রা রঙিন স্বপ্নের মতো একটা অপূর্ব্ব মেয়েকে দেখতে পেলেন তিনি। চার চোখের মিলনের সঙ্গে সঙ্গে সাড়া জাগলো তার সারা মনে। আবৃত্তি করলেন তিনি— 'নিগাহে একবার মিলতি হ্যায় বারবার নেহি মুহাব্বাৎ ইসসে হোতি হ্যায় আপ্পার ইনকার নেহি। চারচোখের প্রকৃত মিলন একবারই হয় বারবার নয়, যদি তোমার আপত্তি না থাকে তবে এতেই আমাদের ভালোবাসা হবে।

কিন্তু ভালোবাসা কি আর সহজ চিজ বাপ না তোদের বোম্বে সিনেমা। তাই তেমন কিছু আসা না

পেয়ে এবং মেয়েটাকে লুকিয়ে যেতে দেখে ফারুক আলি ঘুরলেন কিন্তু আশা ছাড়লেন না। যথেষ্ট ক্ষমতা রাখেন তিনি। এবং এদেশের কোন অবিবাহিতা তরুণী-রও অনুপযুক্ত তিনি নন. তবে ভয়টা কিসের ওই মেয়েটাকে ভালো লেগেছে তাঁর, ওই সুন্দর মুখ ছাড়া অন্য কিছু কল্পনা করেন না তিনি। ওকেই চাই ওকে ছাড়া আর কাউকে নয়। ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত মনে পড়ল তাঁর—আগার আতুকে সিরাজি বাদস্ত আরজ দিল মারা, বখানে হিন্দ আশ রকশম সমরখন্দ ও বোখারারা' যদি সিরাজ নগরের লাবন্যবতি উপহার বলে বরণ করে নিতে আমাব এই নিবেদিত হৃদয়কে তবে তার কপোলের কালো তিলের বদলে বিলিয়ে দিতে পারতাম আমি সমরখন্দ আর বোখারার মতো দুটো সহরকে।

ফারুক আলিও পানের নি মেরাজনগরের মে য়ে টা র জন্য। উনিও দেখেছেন ওর চিবুকের নিচে একটা কালো তিল ওই সৌন্দর্য্যময়ী, জোৎস্নার মতো রূপবতী মেয়েটার জন্য তিনিও পাবেন তাঁর তিন চারটে নৌকো ভর্ত্তি জিনিষপত্র বিলিয়ে দিতে।

যাইহোক অত উত্তেজিত হ'লে চলবে না। ধীরে ধীরে এগোতে হবে, খবর নিতে হবে। উনিও তার চেষ্টা করতে লাগলেন বন্ধুদের বললেন, খোঁজ নাও, কে ও? অমন সুন্দরী শুধু আমাকেই শোভা পায়, ও শুধু আমারই।

প্রেমে পড়লে বোকারা বুদ্ধিমান হয় আর বুদ্ধিমানরা বোকা, তাই ফারুক আলি বোকার মতো আরো কতকগুলো আজেবাজে বকলেন। বন্ধুরা বলল, আগে কেমন বংশ, কি রকম চালচলন দেখতে দাও, তুমি হচ্ছ কতো বড় ঘরের ছেলে, যাকে তাকে—

—এমন কথা মুখে এনো না ও যে সে মেয়ে নয়। আমি ওকে এক পলকেই চিনেছি।

—এক পলকে চিনবার মতো চিজ মেয়েরা নয়, অন্য বন্ধু বললেন, ওদের অন্তর অস্ত্রোপচার করেও কিছু বোঝা যায়না ও তো তোমার এক পলক।

এবার রেগুলার রেগে উঠলেন উনি। বন্ধুদের ভাগিয়ে দিলেন। অমন মেয়ে দেখলে বুড়ো মানুষের মন খারাপ হয়ে যায় ও বেচারা তো

বয়সে অরুণ। সাহস সঞ্চয় করে বাপকে বললেন উনি। সওদাগর তো রেগে মেগাটন বম্ব হয়ে গেলেন, এই ফাটে তো সেই ফাটে। চোখ দুটো লাল হয়ে উঠল ভ্রূ কুঞ্চিত হল, হাত পা কাঁপতে লাগলো। শুধু বললেন একথা দ্বিতীয়বার বলবেনা আমার সামনে। আমার ছেলে হয়ে এতবড় বেয়াদবি, বেতমিজি তোমার সাজেনা।

—প্রেম ফ্রেমকে আমল দিতেন না বুঝি সওদাগর? স্বপন জিগ্যেস করল।

—ঠিক তা নয়। ফারুক আলি যদি বলতেন ঐ মেয়েটাকে আমার ভালো লেগেছে আপনি দেখুন মানে একটু ভক্তি ভরে বললে হয়তো সওদাগর রাজি হতেন। একটাই ছেলে তো! কিন্তু তা না বলে সরাসরি একেবারে আলেকজাণ্ডারের সামনে পুরুর মত মাথা উচু করে বললেন ঐ মেয়েটাকে আমি বিয়ে করতে চাই। এই বেয়াদবি সহ্য করতে পারলেন না ফজল আলি। সাধারণতঃ সব বাপই চান ছেলেরা একটু মাথা হেট করে ভক্তি ভরে কথা বলুক। সবাই তো আর আলেকজাণ্ডার নয়। এছাড়া অন্য ব্যাপারও ছিল। ফজল আলি জমানত পুরের জমিদার জাফর হোসেনের একমাত্র কন্যা জুবেদা বেগমের সঙ্গে তাঁর ছেলের সম্বন্ধ করেছিলেন। এ বিয়েতে ফারুকের আখেরে ভালো করতেই চেয়েছিলেন তিনি। সওদাগর থেকে জমিদারের পর্য্যায়ে উঠতো সে কিন্তু ছেলে তার না-ছোড় বান্দা।

বাপ যখন আমল দিলেন না তখন হবু শ্বশুরের কাছেই প্রস্তাব করলেন গিয়ে। ফারুকের মতো ছেলে পাওয়া সৌভাগ্যের কথা তাই অতি সহজেই রাজি হয়ে গেলেন মেয়ের বাপ। এবং এক শুভদিনে শুভলগনে, শুভকাজ সুসম্পন্ন হয়ে গেল। মেরাজ নগরের অন্যতম সুন্দরী মোসাম্মত মতিয়ারা বেগম ফারুক আলির বিবি হয়ে গেলেন।

—তারপর? চাচা একটু থামতেই প্রশ্ন করলাম আমি।

—তারপর সেই ফ্যাসানেবল খুবসুরুত বিবিকে নিয়ে সহরের একটা ভাড়াবাড়িতে উঠলেন ফারুক আলি।

—ভাড়াবাড়ি কেন?

—কারন সওদাগরের এবিয়েতে

মত ছিলনা। এবং আগাগোড়া কোন কাজেই যোগদান করেননি তিনি। ছেলে কোন সাহসে বৌ নিয়ে তাঁর কাছে যাবে বলো বাপ তাই অগত্যা ভাড়াবাড়ি।

ব্যবসা ডকে উঠল। ফারুক আলি কবিতা লিখতে সুরু করলেন। কাজল কালো চোখ আর রাঙা ঠোঁটের বর্ননায় কাগজ ভরে উঠলো। বেগম সাহেবার চলার ছন্দ সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাকেও হার মানায়। কথা বলেন যেন তানপুরার তারে কোমল হাতের পরসলেপে মিঠে সুরবাজে। হাঁসেন যখন মনে হয় লক্ষ জোনাকি ঘন আঁধারে নিবু নিবু দীপ জেলে দিল, চোখের চাহনিতে মনে হয় হৃৎপিণ্ডে ইলেকট্রিক কারেন্ট লাগলো। মানে সে এক প্রেমের এলাহি ব্যাপার।

মেয়াজনগরে মজিয়ারা বেগম তখন নাম করা আধুনিকা মেয়ে। সবাই হতে চায় তার মতো, সব মেয়েরা অনুসরণ করে তাকে, অনুকরণ করে তার সাজগজ্জা, চলন বলন।

সেদিন বাজারে এক জহরির দোকানে পান্নাখচিত দামি একটা হার দেখে বায়না ধরলেন মজিবেগম, ওটা আমার চাই। ফারুক আলি সর্ষেফুল দেখলেন চোখে, প্রমাদ গনলেন মনে মনে। ইতিমধ্যে যথেষ্ট সাড়ী গহনা দিয়ে মন ভরিয়েছেন বেগম সাহেবার। হাতে যে কটা আসারফি ছিল সব ফুরিয়েছে। ঐ পান্নার হার কেনার ক্ষমতা নেই এখন।

তিনদিন অভিমান করে থাকলেন বেগম সাহেবা। আষাঢ়ের মেঘ জমল সারা মুখে, হাঁসি খুসি একবারে বন্ধ। ফারুক আলি বললেন, তোমার জন্যে বাপের ত্যাজ্যপুত্র হয়েছি আমি, কোন মুখে যাব তার কাছে, আর ব্যবসার অবস্থাও তথৈবচ।

—তা বলে মনের সখ মিটবে না আমার। বেগম বললেন, এটুকু যদি না পার তবে কেন বিয়ে করেছিলে আমাকে।

ফারুক আলির মন সাইকেলের টিউব লিক হ'ওয়ার মতো চুপসে

গেল। তবু বললেন, তোমাকে ভালোবেসেছিলাম তাই, তুমিও নিশ্চই আমাকে ভালোবাস।

—ওসব কথা অনেক শুনেছি। তোমাকে দিনরাত দেখলে কি আমার পেট ভরবে।

আরো অনেক কথা শোনালেন মতি বেগম। বেচারা ফারুক আলি মুখ বুজে সব সহ্য করলেন, শাড়ী, গহনা, প্রসাধন যথেষ্ট জুগিয়েছেন, এখন বাড়ী ভাড়া বাকী পড়েছে। দুদিন পর হয়তো পেটের ভাড়া বাকী পড়বে।

তবুও কর্ম্মঠ ফারুক আলি সব কিছু ম্যানেজ করে নিচ্ছিলেন। সারাদিন খাটনির পর রাতে এসে ক্লান্ত শরীর বিছানায় এলিয়ে দ্যান আবার সকালে উঠে বেরিয়ে যান।

একটা জিনিষ লক্ষ্য করেন উনি। সকালে উঠে কোনদিন বিছানায় দেখতে পাননা বেগম সাহেবাকে। কোন ভোরে উঠে চলে যান পাশের ঘরে। এ অভ্যেস মতিবেগমের গোড়া থেকেই লক্ষ্য করেছেন তিনি। কিছু মনে করেন নি। হয়তো ভোরে উঠা অভ্যেস ওঁর, এবং এটা স্বাস্থের পক্ষে ভালো তাও তিনি জানেন।

ঘুম থেকে উঠেই বেগম সাহেবার খুবসুরত হাসনুহানার গন্ধ ছড়ানো মুখখানা দেখেই সারা মন ভরে উঠতো তাঁর। বিছানায় শুয়ে শুয়েই একদৃষ্টে তাই চেয়ে দেখতেন। গর্ব্ববোধ করতেন মনে মনে এমন একটা সুন্দর মুখের অধিকারি বলে। এখনো সেই মুখই ছাখেন তবে মনের এ অবস্থায় ভালো লাগেনা তার। ভাবেন এত সকালে উঠে পাশের ঘরে যাওয়ার কি এমন দরকার? কিসের এত তাড়া।

দেখতে হবে ব্যাপারটা কি? ফারুক আলির মন সন্দেহপ্রবন হয়ে ওঠে। এতদিন অনেক কিছুই এড়িয়ে গ্যাছেন তিনি এবার সব কিছুতেই মন প্রতিবাদ ক'রে তাঁর। হাজার হোক পুরুষ মানুষ তো। তাছাড়া চিরদিন আরাম আয়াসে, সুখের নীড়ে প্রতিপালিত তিনি, এক'দিন খাটনির চোটে মন বিষিয়ে উঠেছে একেবারে। বিয়ে করার পর থেকেই বেগমের এই ভোরে উঠে পাশের ঘর যাওয়াটা লক্ষ্য করেছেন তিনি। এই রহস্যের কালো পর্দ্দা চোখের সামনে থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে

ওঠে তার পুরুষ মন।

সিভিলিয়রা, শিশির পড়া ভোর বেলা। পাখির কাকলি, ভেসে আসে খোলা জানালা দিয়ে। মেরাজ্ নগরের মসজিদে আজানের মধুর সুর ভেসে ওঠে। মাখনওয়ালা হেঁকে চলে যায় লোকের দোরে দোরে। ফারুক আলির ঘুম ভাঙ্গে। দেখতে পান বেগম সাহেবা পাশের ঘরে ঢুকলেন, ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করলেন।

বিছানা থেকে উঠে পড়েন উনি। ধীরে পায়ে এগিয়ে যান সেই ঘরের পাশে। ছোট একটা ফাঁক দিয়ে ছাখেন তিনি।

এ ঘরটা মতিবেগমের ড্রেসিংরুম। এত প্রসাধন সামগ্রী যেন মনে হয় কোন বিজ্ঞানির ল্যাবরেটারি। বড় আয়নার সামনে গিয়ে বসেন উনি। আর সেই মুখটা দেখে চমকে ওঠেন ফারুক আলি। ঢিলে ঢিলে চামড়া, এখানে ওখানে ছোট ছোট ভাঁজ, কেমন যেন বীভৎসতায় ভরা। কোথায় সেই চিবুকের নিচের কালো তিল আর কোথায় বা সেই টানা টানা ভ্রূ! একি সেই ছাদে ছাখা সুন্দরী! এই কি মতি বেগম? চেনা যায়না ঐ মেয়েটাকে, কে যেন অপরিচিতা বসে আছে ওখানে।

নিপুন হাতে চলতে থাকে প্রসাধন। রূপ বদলাতে থাকে বেগম সাহেবার। নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে ছাখেন ফারুক আলি। চোখের সামনে একটা কাঠের পুতুল রঙে, রূপে যেন অপরূপা হ'য়ে উঠছে। আস্তে আস্তে কেমন যেন বদলাতে থাকে, যেন বীভৎসতার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে সৌন্দর্য্যের রাণী মতিবেগম।

গুলজার চাচা থামলেন এবার। গড়গড়েতে টান দিতে লাগলেন অনেক ক্ষণ পর।

রহমান কি বলতে যাচ্ছিল তাকে থামিয়ে দিয়ে চাচা বললেন, বুঝলে বাপ ঐ পেন্টীং এর পলস্তারা দেখেই ভুলেছিল ফারুক আলি, আসল কি নকল তা ছাখার মতো ধৈর্য্য তখন ওঁর ছিল না। রং দেখেই ওঁর মন রঙিন হ'য়ে উঠে ছিল ও জানতো না যে ওসব মেয়ে হচ্ছে দিল্লী কা লাড্ডু, যো খায়া ও ভি পস্তায়া, যো নেহি খায়া ও ভি পস্তায়া।

চাবি

—জীবনময় দত্ত

বাড়িটা অনেকটা রেলওয়ে কোয়াটারের মতো। ছোটো ছোটো দুখানা কামরা। পেছন-দিকে একফালি বারান্দা। তারপর লম্বা খানিকটা উঠোন। সামনে পেছনে দুদিকেই দরজা আছে। ষ্টেশন থেকে বেশ খানিকটা দূর। আসে পাশে দুএকটা বাড়ি আছে মাত্র। তা ছাড়া বড়ো বড়ো গাছ আর ফাঁকা মাঠ।

মাস দু'য়েকের জন্য যখন পাটনায় বদলী হয়ে এলাম তখন এই বাড়িতেই এসে উঠেছিলাম। তখন পাটনার এতটা উন্নতি হয়নি। ষ্টেশনের কাছাকাছি এত কোয়াটারও ছিলনা।

আমাদের পাড়ার মিত্তিরদা পাটনা-তেই রেলে চাকুরী করতেন। তাঁকে আগেই চিঠি লিখে দিয়ে-ছিলাম। তিনি ষ্টেশন থেকে এই বাড়ীতে নিয়ে এলেন। বললেন—অসুবিধে কিছু হবে না। দুজনে বেশ থাকব। তবে যেদিন আমার লাইনে ডিউটি থাকবে সেদিন তোমায় একা থাকতে হবে, এই যা।

বললাম—তার জন্য কি আছে। ও আমার অভ্যাস আছে।

সত্যি কোন অসুবিধাই নেই। নিজেরাই রান্না বান্না করি। সকালে খাওয়া দাওয়া সেরে বেরোই আর সারাদিন চরকির মতো ঘুরি। সন্ধ্যায় ফিরে আসি। মিত্তিরদা না থাকলেও কোন অসুবিধা হয়

না। আমার কাছে একটা চাবি থাকে। মিত্তিরদার কাছেও একটা থাকে। সুতরাং যে যখন বাইরে যাই তালা দিয়ে যাই। মিত্তিরদা একটু অদ্ভুত ধরণের লোক। খাওয়া দাওয়ার বিশেষ ঝামেলা নেই। কাঁচাই বেশী খান। ন্যাচারপ্যাথী করেন। আধুনিক। এ্যালোপ্যাথ চিকিৎসকদের ওপর কে জানে কেন ভীষণ চটা। রেলের টি, টি, ই হওয়ায় তিনি প্রত্যেক সপ্তাহেই কলকাতা যাতায়াত করেন। ওখানে তাঁর পরিবারের অন্য সকলে থাকে। তাই আমাকে প্রায়ই একা থাকতে হয়।

একবার কলকাতা থেকে তাঁর অসুস্থ পিতাকে নিয়ে এলেন ফেরবার সময়। নানা রকম অসুখে ভুগছেন তিনি। অনেক চিকিৎসা হয়েছে কিন্তু বিশেষ কোন সুফল পাওয়া যায়নি। সেজন্য সকলের নিষেধ আর নানা অসুবিধা সত্বেও মিত্তিরদা তাঁকে এখানে নিয়ে এলেন। ন্যাচারপ্যাথী পদ্ধতিতে চিকিৎসা করবেন। তার জন্য নিজে ছুটিও নিলেন এক মাস।

আশ্চর্য হলাম। দিন পঁচিশের মধ্যে মেশোমশাই উঠে চলফেরা শুরু করলেন। আগে অবশ্য সামান্য পারতেন। তবে এখন বেশ ভাল-ভাবেই। মিত্তিরদা ডেকে বললেন—কি হে দেখলে তো। তোমাদের এ্যালোপ্যাথী তো এতদিনেও কিছুই করতে পারলো না। অথচ খরচের বেলায় তো মুখে রক্ত ওঠার জোগাড়।

কি আর বলব। চুপ করে রইলাম। মিত্তিরদা প্রাকৃতিক চিকিৎসা সম্বন্ধে এই সুযোগে ঝাড়া এক বক্তৃতা দিয়ে বসলেন।

ক-দিন পর হঠাৎ আমাকে একটা মফঃস্বল সহরে যেতে হয়েছিল। এবার আর চাবি নিয়ে গেলাম না। পারতপক্ষে মেশো-মশাই আসার পর চাবি নিয়ে যাবার দরকারও হয় না। মেশোমশাই বেশ সুস্থ এখন। তাই চাবির ফ্যাচাং আর করলাম না।

ফিরতে দিন সাতেক দেরী হয়ে গেল। যে দিন ফিরলাম সে দিন ট্রেনে অসম্ভব ভীড়। কি একটা স্নানের দিন ছিল। গ্রাম থেকে সব গঙ্গাস্নান করতে চলেছে। তার ওপর দু'জায়গায় গাড়ী বদল

ওমা কি হবে গো পটলা এই বয়েসেই বোতল ধরেছে যে গো !

করতে হয়েছে। ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে গরমে, ভীড়ের চাপে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তার ওপর ক্ষুধা। শরীর বুঝি আর সইতে পারবেনা। ট্রেন যখন পাটনা ষ্টেশনে পৌঁছালো তখন রাত দশটা গিয়ে রান্নার ঝামেলা করার ইচ্ছে ছিলনা। আর মিত্তিরদা বা মেশোমশাই কেউ জানেন না আমি সঠিক কবে ফিরব। সুতরাং বাজার থেকে চিঁড়ে আর দই নিয়ে নিলাম। তারপর হন্ হন করে রওনা দিলাম বাড়ীর দিকে। গরমের দিন হলেও এদিকটা স্তব্ধ হয়ে গেছে। রাস্তা এবড়ো খেবড়ো আকাশ অন্ধকার। তাই গতি বারবার শ্লথ হয়ে যাচ্ছে। P 36,147

কিছুদুর আসার পর একটা গাছের নীচে গাঢ় অন্ধকারে কাউকে আসতে দেখলাম। কেমন যেন

একটু অস্বাভাবিক লম্বা মনে হলো লোকটাকে। আর এই অন্ধকারের মধ্যে এরকম হেলে দুলে যে কেউ চলতে পারে ধারণা ছিলনা। এদিকের প্রায় সকলের সঙ্গেই চেনাশোনা হয়ে গেছে মোটামুটি। এত লম্বা লোক তো কেউ নেই তাদের মধ্যে।

হবে কেউ। চিন্তা ঝেড়ে ফেলে পা চালালাম। কাছাকাছি এসে গেছি। কি জানি কেন গা'টা ছম ছম করে উঠলো একটা অজানা ভয়ে। অন্ধকারটাও যেন একটু বেশী মনে হলো। পাশে আসতেই একটা চেনা গলা কানে এলো—আরে জীবন না! এই রাতের গাড়ীতে ফিরলে বুঝি। এই নাও চাবিটা নিয়ে যাও। আমি একটু বাজারে যাচ্ছি লেবু আনতে। খেয়াল ছিল না। সকালে উঠেই তো লেবুর জল খেতে হবে। নাও চাবিটা ধর।

কেমন যেন ফ্যাসফ্যাসে গলায় কথাগুলো বেরিয়ে এলো মেশোমশাইর গলা দিয়ে। এখন আর আগের মতো ততটা লম্বা লাগছে না। আমি একটু চমকে উঠলাম। আমায় কিছু বলতে না দেখে তিনি আবার বললেন নাও চাবিটা ধর। রাত হয়ে যাচ্ছে। কেমন যেন ক্লান্ত আর অবসন্ন গলার আওয়াজ।

অন্ধকারেই হাত বাড়িয়ে চাবিটা নিলাম। মেশোমশাইর আঙুলের সঙ্গে আমার আঙুলের ছোঁয়া লাগলো। কি অসম্ভব ঠাণ্ডা সে আঙুল। হিম শীতল সেই আঙুল যেন এই মাত্র বরফ থেকে উঠিয়ে এনেছেন। শিউরে উঠলাম।

—আমি যাই। মেশোমশাইর গলা বাতাসে মিলিয়ে গেলো।

আবহাওয়াটা যেন এতক্ষণ থমকে ছিল। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। সারা গা দিয়ে ঘাম ঝরছে।

চলতে শুরু করলাম। একটা কথা মনে হতেই লজ্জায় সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেলো। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। এই বুড়ো মানুষ এত রাতে বাজারে গেলেন। আমারই যাওয়া উচিত ছিল। কি ভাবলেন কে জানে। পিছন ফিরে তাকালাম। আশ্চর্য। দেখতে পেলাম না। অথচ এক মিনিটও হয়নি বোধ হয়। অসুস্থ দুর্বল শরীর নিয়ে এত তাড়াতাড়ি গেলেন

কি করে।

কিন্তু বেশি ভাবতে পারলাম না। অশেষ ক্লান্তি আর ক্ষুৎ-পিপাসায় শরীরের স্নায়ুগুলি সব ঝিমিয়ে পড়েছিল অবসাদ এসে বাসা বেঁধেছে শরীরের প্রতিটি কোষে। শুধু মাত্র বিছানায় পড়ার অপেক্ষা।

তালা খুলে খাটিয়া টেনে উঠোনে ফেললাম। ক্লান্ত শরীরটা একটু জিরিয়ে নেবার আশায় খাটিয়ার ওপর হাত পা ছড়িয়ে দিলাম। চিঢ়ে দই পড়ে রইলো একপাশে।

কখন যে ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েছিলাম জানি না। মিস্তিরদার ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙলো। হয়ত বেনারস এক্সপ্রেসে রাত একটায় ফিরেছেন। চোখ মেলে দেখি. রোদদুরে ভরে গেছে উঠোন।

মিস্তিরদা জিজ্ঞেস করলেন—কি

দ্বিতীয় সপ্তাহে···

উত্তরা ঃ উজ্জ্বলা ঃ পূরবী

এবং অন্যত্র

হে ভেতরে এলে কি করে। চাবি তো নিয়ে যাওনি।

অবাক হলাম।

—কেন মেশোমশাই দিলেন। ফেরার সময় দেখা। উনি বাজারে যাচ্ছিলেন লেবু আনতে।

—মেশোমশাই ?.....বাবা ? মিত্তিরদা যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

ততক্ষণে মিত্তিরদার চেহারা দেখে আমিও চমকে উঠলাম। একমুখ দাড়ি। বড়ো বড়ো রুক্ষ চুল। চকিতে একবার চারদিকে চাইলাম।

মিত্তিরদা বুঝলেন। বললেন—তুমি যাবার দুদিন পরেই হঠাৎ হার্টফেল করেন বাবা। কেমন যেন কান্না মেশানো সুর মিত্তিরদার।

সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো আমার। গত রাতের সমস্ত ঘটনাটা ছবির মতো ভেসে উঠলো মনের ভেতর।

—কিন্তু চাবি। একটা অস্পষ্ট আওয়াজ বেরিয়ে এলো আমার মুখ দিয়ে।

—ঐতো তাকের ওপর রয়েছে। মিত্তিরদা বললেন। উঠলাম বিছানা ছেড়ে। অনেকটা যন্ত্র-চালিতের মতো মিত্তিরদাও এলেন সঙ্গে। সত্যিই চাবিটা তাকের ওপর যেমনি রাখা ছিল তেমনি রয়েছে।

বিদ্যুৎ চমকের মতো কথাটা আমার মনে এলো। দরজা তো ভেতর থেকেই বন্ধ ছিলো। তাহলে মিত্তিরদাই বা এলেন কি করে।

পরস্পরের দিকে তাকালাম দুজনে। কোনো কথা বের হলো না কারো মুখ দিয়ে। পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলাম স্তব্ধ বিস্ময়ে।

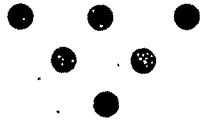

পরিণয় সূত্র

—মণি চৌধুরী

[এক]

শ্যামলী আমার সঙ্গে এতটা চালাকী করবে কল্পনাও করি নি। রাগে দুঃখে মাথার চুল টেনে ছিড়ে ফেলতে ইচ্ছে হলো। সারা রাত ঘুম হলো না দুশ্চিন্তায়! ছটফট করে কাটিয়ে দিলুম। নাঃ এর একটা বিহিত করতেই হবে।

পর দিন ভাই বন্ধুবর অমলের স্মরণাপন্ন হলুম। দেখা যাক যদি কোন ক্লু তার মাথা থেকে বেরোয়।

অমল দিন কয়েকের ছুটিতে বাড়ী এসেছে। চাকরী করে অব্বল-পুরে।

সব কথা বল্লুম তার কাছে—শুনলো সবই সে মনোযোগ দিয়ে। ট্রেনের কামরায় যে নোট বুকখানা কুড়িয়ে পেয়েছিলুম—যার প্রাপ্তি আমার মাথায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল,—সেটাও তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করলো। কিন্তু বলতে পারল না কেন এবং কি অবস্থায় শ্যামলীর হাতের লেখা—তার নাম, বাড়ীর ঠিকানা, ইত্যাদি এলো এর মধ্যে।

রহস্যের কোন কিনারা হলো না।

অতএব ঠিক করা গেল দু বন্ধুতে মিলে রোববারে যাব শ্যামলীর বাসায়। এ বিশ্বাসঘাতকতা কেন করলো সে কৈফিয়ৎ চাইব তার কাছে আর সম্পর্ক ঘুচিয়ে আসবো

চির দিনের মতো। মেয়ে জাতটাকে বিশ্বাস করতে নেই।

[দুই]

রোববার সকালে শ্যামলীদের বাসার দরজায় কড়া নাড়তে যে ভদ্রলোক দরজা খুলে আমাদের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলেন চিংড়ি মাছের মত, চিনতে পারলুম না তাকে।

—কাকে চাই। প্রশ্নটা যেন নেহাৎ ছুড়ে মারেন ভদ্রলোক।

অমল আমার দিকে তাকায়। আর আমি তাকাই ভদ্রলোকটির দিকে।

বুঝতে পারি না কিছুই। এ প্রশ্নের অর্থ? শ্যামলীর বাসায় এত দিন বিনা প্রশ্নে বিনা বাধায় ঢুকেছি। আজ হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন? আর শ্যামলীর মাষ্টারী করি না তাই বলেই কি?

একটু পরেই হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে বলে ওঠেন ভদ্রলোক—মাফ করবেন। একটু দাঁড়ান আপনারা দয়া করে, আমি এই আসছি।

বলেই হঠাৎ অন্দর মহলে ঢুকে পড়েন শশব্যস্তে।

—কিরে, ব্যাপার খানা কি? অমলের চোখে মুখে বিস্ময়। কোথায় নিয়ে এসেছিস বলতো?

ঠিকই এসেছি। ভুল করবো কেন রে? পুরো একটি বছর এসেছি শ্যামলীকে পড়াতে এই বাসায়। মাঝে মাস দুই আসিনি বটে। তাই বলে এতটা ভুল হবে?

—কি জানি বাবা। অমলের কথায় মনে হলো সে যেন খুব একটা ভরসা পেল না।

ভদ্রলোকের পুনরাবির্ভাব ঘটলো। চোখে মুখে এবারে তার একটা বিনীত বিগলিত ভাব।

—আসুন, আসুন আপনারা দয়া করে। কিছু মনে করবেন না। অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি। আপনাদের। ভেতরে খবরটা একটু দিয়ে এলুম তাইতেই—

—কিসের খবর বলুন তো? প্রশ্ন করি আশ্চর্য্য হয়ে।

কোনো উত্তর নেই। ভদ্রলোক কানে খাটো নাকি?

যে ঘরে শ্যামলীকে পড়াতুম, ভদ্রলোক সেই ঘরে আমাদের এনে বসালেন।

—স্যার এটা কোন গাড়ী ?

—রেলগাড়ী।

তার পরই হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন।

—ব্যাপারটা কি বলতো মণি ? অমল বলে ওঠে।

ব্যাপারটা যে কি আমিও ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলুম না তাই জবাব দিলুম না।

ঘরটার কেমন যেন একটা অচেনা পরিবেশ। খাঁ খাঁ করছে যেন। শুধু একটা তক্তপোষ এক কোণে বিরাজ করছে। তাইতেই বসেছি আমরা।

দু মাস আগে তো এমন ছিল না।

বসে আছি আর ভাবছি।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি কে এক ঘোমটা মোড়া ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকছেন হাতে তার দু প্লেট খাবার।

তিনি সে দুটিকে আমাদের সামনে রেখে দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঢুকলো একটি বারো চোদ্দ বছরের কিশোরী জলের গ্লাস নিয়ে। ঠক ঠক করে জলের গ্লাস দুটিকে আমাদের পাশে রেখে সেও বেরিয়ে গেল ত্বরিত পদে।

—কে এরা?' কথা দুটি হঠাৎ যেন আমার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে।

—বারে, তুই জানিষ না তো কি জানব আমি? কোথায় নিয়ে এলি বাপু কিছুই বুঝছি না।

—নিন নিন খেয়ে ফেলুন। চুপ করে বসে আছেন কেন? লজ্জা কি?

ভদ্রলোক ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েন ব্যস্ত সমস্ত ভাবে।

—দেখুন ব্যাপর কি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমরা এসেছি অন্য কাজে। এসব খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারই বা কেন আর অত ছুটো-ছুটিই বা করছেন কেন আপনি?

—আহাহা, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? যে কাজে এসেছেন ঠিকই হবে সে কাজ। মিষ্টি মুখ তো আগে করে নিন।

তার পরই হঠাৎ—বসুন আপনারা, এই আসছি আমি। বলেই নিষ্ক্রান্ত হলেন আবার।

ক্যাবলার মত দুজন দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকি আমরা। কথা যোগাচ্ছিল না কারুর মুখে, কাণ্ড কারখানা দেখে।

সেই চঞ্চলা কিশোরিটি আবার ঢুকলো। মেঝেতে একটা মাদুর বিছিয়ে দিয়ে সটকে পড়লো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আমাদের দিকে একবার চেয়ে দেখলো, মুখে দুষ্টুমির হাসি।

কিন্তু আমাদের মুখে হাসি ছিল না।

একটু পরেই যা দেখলুম, তাতে করে এখানে আর নিরাপদ বলে মনে হলো না।

শাড়ী ব্লাউজ আর প্রসাধনে মোড়া একটি অষ্টাদশী [?] লজ্জাবতি ভঙ্গীতে এবং ধীর পদক্ষেপে ঢুকলো ঘরের ভেতর। অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে বসলো মাদুরের ওপর আর মুখ নীচু করে নখ খুঁটতে লাগলো। নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে।

ভদ্রলোকটিও ঢোকেন পেছন পেছন।

—নিন যা জিজ্ঞেস করবার করে নিন। এই একটিই মেয়ে আমার, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী যেন। মা আমার চলে গেলে কি করে যে থাকবো! ভারী হয়ে আসে ভদ্রলোকের গলা।

তড়াক করে উঠে পড়ি আমি। আর নয়; অনেক হয়েছে। অমলও উঠে পড়ে কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হয়ে। মরিয়া হয়ে বলি ভদ্রলোককে।

—দেখুন আপনারা বোধ হয় ভুল করেছেন। আমরা মেয়ে দেখতে আসিনি। আমরা এসেছিলুম এই বাড়ীতেই মানে—ঘরটার চার পাশ থেকে একটা অস্পষ্ট হাসির আওয়াজ ভেসে এলো আমার কথা শুনে। তাকিয়ে দেখি মেয়েরা বউরা ইত্যাদিরা ভীড় করেছে জানালা দরজার পাশে।

না বাবা কেনো ভুলই করিনি আমরা। তোমরাও ঠিক জায়গাতেই এসেছো।

—মোটেই না। মেয়ে দেখতে আসিনি আমরা। আমরা এসেছিলুম মিঃ চৌধুরীর বাড়ীতে অর্থাৎ মিস শ্যামলী দেবীর বাবার এখানে।

হঠাৎ হেসে ওঠেন ভদ্রলোক।

—ওঃ হোঃ এই ব্যাপার। বুঝেছি। হয়েছে। আচ্ছা এবার যা যা জিজ্ঞেস করার আছে করে নাও। সব ঠিক হয়ে যাবে।

—কিন্তু শুনুন, ব্যাপার কি না জানলে—আর আপনাকে আমরা চিনি না, এ অবস্থায় আপনি কেন এসব কথা বলছেন কিছু বুঝছি না।

—তোমরা আমায় চেননা ঠিকই। স্বীকার করছি। কিন্তু বাবাজীবনের বাবা (অমলের দিকে হাত বাড়াইয়া) হরিপদ বাবু ঠিকই চেনেন আমায়।

—তাতে কি হয়েছে, কি যায় আসে তাতে? অমল রেগে ওঠে হঠাৎ। কেন এসব হাসি ঠাট্টার ব্যাপার করছেন?

—এই নাও। বোঝইনি বাবা আসল ব্যাপারটা তা হলে? এখনও বোঝ নি? আচ্ছা বেশ, দেখতো বাবাজী এ ফটো খানা তোমারই কি না? পাশপোর্ট সাইজের একখানা ফটো বের করে দেখান তিনি!

—হ্যাঁ ফটোখানা তো আমারই দেখছি। এটা আপনার কাছে এলো কি করে? বিস্ময় ভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করে অমল।

—এই ছাখো, এটা বুঝতে অসুবিধার কি আছে? তুমি বিদেশে থাক তাই তোমার ফটো পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তোমার বাবা। তা তুমি স্বয়ং হাজির হয়েছো, এর চেয়ে আনন্দের কি থাকতে পারে বল।

—কিন্তু আমি মেয়ে দেখবো বলে তো আসিনি।

—তাতে কি হয়েছে এসেই গেছ যখন খুবই শুভ লক্ষণ এটা বুঝতে হবে। আমি অবশ্য তোমার বাবাকে লিখে দিয়েছিলুম যে বাসাটা বদলী করবো। আমরা পুরোনো বাসা ছেড়ে এ বাসায় এসেছি আজ দিন পাঁচেক। এ খবর অবশ্য তোমার না জানাই স্বাভাবিক। আর তাতেই যত গোল। আমরা তো ধরে নিয়েছিলুম তোমরা এসেছো—

—আশ্চর্য্য ব্যাপার তো! অমল বলে।

—আমি তো ঘাবড়ে গেছলুম প্রথমটা তোমাদের দেখে। ভাগ্যিস ফটোখানা ছিল! দেখতো কি আশ্চর্য্য যোগাযোগ।

হাসিতে ফেটে পড়েন ভদ্রলোক। আমরাও হাসি। আর হাসে বাইরের মেয়েলি জনতা যারা ভীড় করে ছিল।

—তোমার বাবা পছন্দ করে গেছেন। এখন তোমার পছন্দ হলেই ছুটি হাত কএ করে দিই—। খুশীতে উপচে পড়েন ভদ্রলোক।

[তিন]

মেয়ে পছন্দ হল অমলের। আমিও অনুকুল রায় দিলুম।

কিন্তু আসল যে কাজের জন্য আসা তার তো কিছুই হলো না। তাই বিমর্ষ হয়ে পড়ি আমি।

সব চুকে গেলে ভদ্রলোক নিজেই পাড়েন কথাটা।

—আপনারা তো মিঃ চৌধুরীর বাড়ী এসেছিলেন। যাক এক কাজে দু কাজ হল।

কোথায় দু কাজ হল! অমলের কাজ হলো। সে তো খুশীতে ডগমগ। তাই কোন জবাব দিই না।

—মিঃ চৌধুরী আজ হপ্তা খানেক হলো এবাসা ছেড়ে চলে গেছেন। ঠিকানাটা বলেন ভদ্রলোক।

খবরটা প্রথমে দিলেই তো এত কাণ্ড হতো না!

যাক্! ভরপেট খেয়ে দু

বন্ধুতে মিলে চল্লুম শ্যামলীর নতুন বাসার দিকে। আবার কি হতে চলেছে কে জানে।

* * *

আমার মুখে সব শুনে শ্যামলী হেসেই সারা হোলো।

—এই ব্যাপার। তার জন্যে এত ছোটাছুটি। আহাহা. মুখখানা যে শুকিয়ে গেছে।

—ঠাট্টা রাখ শ্যামলী। আমি জানতে চাই এ নোটবুকের মধ্যে তোমার হাতের লেখা এলো কি করে?

—কিন্তু তুমি পেলে কি করে ত্রাটাকে? আজকাল গোয়েন্দা গিরি করছো নাকি আমার বিরুদ্ধে!

পেয়েছি একটা ট্রেণের কামরায়। কাজে যাচ্ছিলুম ফার্ষ্ট লোকালটায় চেপে। শেয়ালদায় ট্রেন থেকে সব নেমে যেতে দেখি এক কোণায় পড়ে আছে নোট বইটা। কৌতূহল হল। তুলে নিয়ে উলটে পালটে দেখতে গিয়ে হঠাৎ দেখি তোমার হাতের লেখা। মায় তোমার বাসার ঠিকানা তার সঙ্গে। ব্যাপারটা কি বলতো? তুমি কি শেষকালে—

আবার হাসে শ্যামলী। রাগে গা জ্বলে যায় আমার। একটু পরে গম্ভীর হয়ে বলে শ্যামলী—তুমি তো আর ত্র পক্ষ মাড়াবে না। দোষ শুধু আমারই দিচ্ছ। তুমি কি মনে কর বিয়ের বয়স হয় নি আমার? আমার বাবা মার উচিত নয় আমার বিয়ের চেষ্টা করা।

—নিশ্চয়ই উচিৎ।

—তাই করছেন তাঁরা। আর তাইতেই আমার নাম ওতে দেখতে পাচ্ছ, আর দেখেই ছুটে এসেছো!

—কি রকম?

—অত উত্তেজিত হয়ো না। শোন। সেদিনে এক বুড়ো ভদ্রলোক এসেছিলেন আমায় দেখতে। দেখলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানা প্রশ্ন করলেন। হাতের লেখাও নিলেন আমার ঐ নোট বইটার মধ্যে। পাকা লোক কিনা! আর কপালগুণে সেইটাই পড়েছে তোমার হাতে। রেগে কাঁই হয়ে গেছ। অবিশ্বাস করছো আমায়। কাঁদো কাঁদো গলায় বলে শ্যামলী।

—কিন্তু বাসা তো দিব্যি বদলেছ। খবরটা দিতেও পার নি।

—কি করে দেব? তোমার বাসার ঠিকানা কি জানি। তাছাড়া

বাবা হঠাৎ স্থির করলেন বাসাটা বদলাবেন। বাড়ীওয়ালা নাকি তাঁকে অপমান করেছিলেন।

আমারই দোষ বুঝলুম। চাকরীটা পেয়ে মাস দুই আর এদিকে আসিনি। যাক ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো যেন। ভাগ্যিস নোট বইটা কুড়িয়ে পেয়েছিলুম।

* * *

আর চেপে রাখা উচিত নয় ব্যাপারটা। শ্যামলীকে আমার চাই-ই। তাই সোজাসুজি প্রস্তাব করলুম শ্যামলীর বাবার কাছে। বর হিসেবে অনুপযুক্ত নই।

সহজে রাজী হলেন না তিনি—বলাই বাহুল্য। আমার চেয়ে ঢের বেশী ভাল পাত্রের সন্ধান নাকি পেয়েছেন তিনি। অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হলো আমাকে এবং শ্যামলীকে শেষ পর্য্যন্ত মত আদায় করতে। আমার বিশ্বাসঘাতকতায় ভদ্রলোক মর্ম্মাহত হলেন বুঝি বা। তা হোন।

* * *

আমার আর অমলের বিয়ে একই তারিখে। তাই দুঃখ, কেউ কারুর বিয়েতে হাজির থাকতে পারবো না।

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

কাগজের এক পিঠে পরিষ্কার হরফে লিখবেন। একটি লেখায় শব্দ-সংখ্যা দেড় হাজারের বেশি যেন না হয়। লেখার নকল রেখে পাঠাবেন, অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হবে না, সঙ্গে ঠিকানা লেখা পোষ্ট কার্ড দেওয়া থাকলে লেখা মনোনীত হলো কি না জানিয়ে দেওয়া হবে। এবং লেখা ছাপা হলে ডাকযোগে আপনাকে কাগজ পাঠানো হবে।

কৌতুক রসের গল্প এবং জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার মজাদার কাহিনী সাদরে বিবেচিত হবে।

নবকান্তর উইল

—অমিয়ধন মুখোঃ

উইলের সর্ত্ত অনুযায়ী নবকান্ত-বাবুর বিশাল সম্পত্তির সমান ভাগ পাবে তাঁর তিন কন্যা। অবশ্য তাঁর অবর্ত্তমানে। মৃত্যুর অনেকদিন পূর্ব্বেই তিনি এই মহৎ কাজটি সম্পন্ন করে রাখেন। বলা ত' যায় না মানুষের জীবন কখন আছে কখন নেই। উইলটা তৈরী করেন আজ থেকে বিশ বছর আগে। এত তাড়াতাড়ি উইল করা নিয়ে নবকান্ত বাবুর বন্ধুরা নবকান্তবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। বন্ধুদের কথা শুনে তিনি শুধু একটু হেসেছিলেন মাত্র। মুখে কিছু প্রকাশ করেন নি।

স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবী অকালে দেহ রাখলেন যেদিন সেইদিন নবকান্তবাবু বুঝলেন সংসারটা বড় মায়াবী। তাই সংসারের মায়া কাটাতে তিনি হরিদ্বারে একটি বাড়ী কিনলেন। শেষ জীবনটা হরিদ্বারে সাধুসঙ্গ করে যদি দিব্য জীবনের সন্ধান পান। ঠিক এই মুহূর্ত্তে উইলটা করে রাখেন। নবকান্তবাবুর কোন পুত্র-সন্তান ছিল না। উইলে স্বাক্ষী রাখা হয়েছিল তিন জামাইকে ও নবকান্ত বাবুর দু'জন বন্ধুকে।

বিশ বছর পূর্ব্বে নবকান্তবাবু সেই যে হরিদ্বারবাসী হয়েছেন তারপর

আর কলকাতায় বা কোন মেয়ের কাছে আসেন নি। মেয়েরা মাঝে মাঝে চিঠি দিলে তার উত্তর শুধু দু' এক লাইন দিতেন। বরাবরই নবকান্তবাবু একটু রাশভারী ও গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন। সব দিকে তাঁর তীক্ষ্ণ নজর ছিল।

হঠাৎ হরিদ্বার থেকে তিন মেয়ে তিনখানি টেলিগ্রাম পেল। 'নবকান্ত বাবুর অন্তিম অবস্থা। মৃত্যু পথের যাত্রী। টেলিগ্রাম পাওয়া মাত্র হরিদ্বারে চলে আসবে'।

নবকান্তবাবুর বড় মেয়ে সুমনা গিন্নীবান্নি। তিন ছেলে আর চার মেয়ের মা। একছেলে আর দুই মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। বাকী আছে দুই মেয়ে আর দুই ছেলে। ছেলে দুটির ভবিষ্যতের আশা ছেড়ে দিয়েছেন কেননা তারা লেখাপড়াও শেখেনি আর চাকরিবাকরিও করে না কিছু। তবে রাজনীতি করে।

সুমনার ইচ্ছে ছিল কোন মতে মেয়ে দুটিকে পার করে স্বামীকে নিয়ে হরিদ্বারে গিয়ে বাপের সেবা করে। সুমনার স্বামী হরবিলাস বাবু আলিপুর কোর্টের উকিল। কালকোটে দুটো পকেট থাকলেও পকেট সব সময়ে খালি পড়ে থাকত। তাই বেলায় কোর্টে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন অনেক দিন ধরে। বড় ছেলের মাইনে আর বাড়ী ভাড়ার আয় থেকেই সংসারটাকে চালিয়ে নিতেন কোন রকমে। বাজেটে ঘাঁটতি পড়ত না সে রকম। বাজে খরচ একদম করতে দিতেন না। হোমিওপ্যাথীটা শিখে নিয়েছিলেন যাতে সামান্য অসুখবিসুখে ডাক্তার ডাকতে না হয়। এদিক দিয়ে তাঁর হাতযশ ছিল বলতে হবে বৈকি। কেননা তেমন কোন শক্ত অসুখ সংসারে কারুরই হোত না। টেলিগ্রামটা পেয়ে হরবিলাসবাবু কি যেন ভাবলেন মনে মনে। বার বার তিনবার টেলিগ্রামটা পড়লেন। সুমনা খবরটা পেয়ে ভেঙ্গে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে স্বামীকে বলল আর দেরী কোন না—চল আজই বেরিয়ে পড়ি। হরবিলাসবাবু বললেন বিপদে এত উতলা হলে কি চলে? যাব ত' বটেই। তবে মাসের শেষ গাড়ী ভাড়ার টাকা জোগাড় করতে হবে ত'।

সুমনা বলল যেতেই যখন হবে তখন টাকাটা তাড়াতাড়ি জোগাড় করে ফেল। শুধু শুধু দেরী করলে হয়'ত বাবাকে শেষ দেখাও দেখতে

—হ্যালো, দমকল শিগগির, আমার বাড়ীতে এক্ষুণি আগুন লাগবে !!

পাব না।

স্ত্রীর কথায় কি ভেবে হরবিলাস বাবু উঠে পড়লেন। জামাটা পরে স্ত্রীকে বললেন তুমি জামা কাপড় গুছিয়ে রাখ আমি টাকা জোগাড় করে একেবারে টিকিট কিনে ফিরব। আজ রাতের গাড়ীতে যাব। কি বল ?

চোখের জলটা মুছে সুমনা বলল আচ্ছা, ফিরতে যেন দেরী কোর না।

রাতের গাড়ীতেই উঠলেন হরবিলাসবাবু স্ত্রীকে নিয়ে। একটু গুছিয়ে বসে স্ত্রীকে বললেন দেখ হরিদ্বারে গিয়ে তোমায় একটা কাজ করতে হবে।

সুমনা স্বামীর কথা ঠিক বুঝতে পারে না, তাই স্বামীর মুখের পানে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। হরবিলাসবাবু স্ত্রীর দিকে একটু সরে এসে বললেন তুমি তোমার বাবাকে বলবে যাতে তিনি আমাদের নগদ টাকাটা একটু বেশী দেন। উইল

অনুযায়ী ত' সবাই সমান ভাগই পাব জানি। কিন্তু তিনি যদি আর দুই মেয়েকে বলে রাজি করিয়ে নগদ টাকাটা একটু বেশী দেন ত ভাল হয়। বুঝতেই ত' পাচ্ছ নগদ টাকার কি রকম দরকার আমাদের। দু' দুটো মেয়ে গলায় ঝুলছে। নগদ টাকাটা অবশ্য যেমন বেশী পাব তার বদলে অন্য সম্পত্তি যা পাব তা একটু কম দিলেই চলবে। তোমার বাবা যদি শেষ সময়ে এ কথাটা অন্য মেয়েদের বলেন তারা কি বাপের শেষ কথাটা রাখবে না? নিশ্চয়ই রাখবে। কি বল?

সুমনা বলল বাবা যদি একটু ভাল থাকেন তবে নিশ্চয়ই বলব। তুমি এখন একটু ঘামিয়ে নাও বরং।

মেজ মেয়ে কামনা টেলিগ্রামটা পেয়েই বাড়ী মাথায় তুললো। স্বামী ব্রজনাথবাবু তখন বাড়ী ছিলেন না। বেশ কিছুদিন ধরে তাঁর ব্যবসা মন্দা চলেছে। তেমন আয় আর হয় না। যেটুকু কুড়িয়ে বাড়িয়ে হয় দুই ছেলেই ভাগ করে নিয়ে নেয়। আগে ব্রজনাথবাবু নিজেই সব দেখাশুনা করতেন। তারপর ছেলে দুটি বড় হতে বিয়েথা দিয়ে তাদের উপরই সব ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ছেলেরা ভার সইতে পারল না। বহুদিনের পুরোণো ব্যবসাটাকে নষ্ট করে ফেলতে বসেছে। ফলে সংসার চলাই দায় হয়ে উঠেছে।

ব্রজনাথ বাবু সব দেখেশুনে চিন্তা করলেন যে লাখখানেক টাকা যদি আপাতত ব্যবসায়ে আবার ফেলা যায় তবে এ যাত্রায় কোন.মতে টাল সামলাতে পারবেন। কিন্তু এত টাকা আসবে কোথা থেকে? শ্বশুর মশাইয়ের কাছ থেকে ত চাওয়া যায় না। তিনি ত একরকম সবই দিয়ে রেখেছেন। গচ্ছিত টাকাও অনেক দিন ধরে খরচ হতে হতে শূণ্য সংখ্যায় এসে গেছে। এখন একমাত্র ধার করা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু শুধু হাতে কে বা টাকা ধার দেবে? আজ অফিসে বসে বসে ব্রজনাথ বাবু শুধু টাকার কথাই ভাবছিলেন। কাজকর্ম্ম সেরে বাড়ী ফিরতেই কামনা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। একেই টাকার চিন্তায় ব্রজনাথ বাবুর মনটা ভাল ছিল না, তার উপর স্ত্রীর এই রকম আচরণে আরও খিচিয়ে উঠলেন ব্রজনাথ বাবু।

কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন আরও কিন্তু স্ত্রীর হাতে টেলিগ্রামটা

দেখে চুপ করে গেলেন।

টেলিগ্রামটা পড়লেন ব্রজনাথ বাবু। 'সবই তাঁর ইচ্ছা' বলে স্ত্রীকে সান্তনা দিলেন। মনে মনে ব্যবসাটাকে কি ভাবে এ যাত্রায় জাগিয়ে তুলবেন তারও একটা ছক এঁকে রাখলেন ব্রজনাথ বাবু।

স্বামীর সান্তনায় পিত্তি চটে যায় কামনার। 'সবই তাঁর ইচ্ছে' এই কথাটা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না কামনা।

ব্রজনাথ বাবুর এমন একটা মুদ্রা-দোষ যে সব কথায় তিনি বলেন 'সবই তাঁর ইচ্ছে।' কথাটা বলার আগে স্থান কাল পাত্র কিছুই ভেবে দেখেন না।

কামনা বলল 'সবই তাঁর ইচ্ছে' মানি, কিন্তু আমাদের হরিদ্বার যাওয়ার ইচ্ছেটা তাঁর হবে কখন?

স্ত্রীর কথা শুনে ব্রজনাথ বাবু বললেন আজ ত আর যাওয়ার ট্রেন নেই, দেরী হয়ে গেছে। কাল সকালের গাড়ীতে যাব। কি বল?

কামনা আর কোন কথা না বলে উঠে অন্য ঘরে চলে যায়। জিনিষ-পত্র বাঁধাছাদা করে রাখতে। কাল সকালে সময় পাওয়া যাবে না বলে।

নবকান্ত বাবুর ছোট মেয়ে ললনা আসামে থাকে। ললনার

৪ঠা মে পতাকা দিবস

মুক্ত হস্তে দান করিয়া আর্তের সেবায়
সহায়তা করুন।

সেণ্ট জন এ্যাম্বুলেন্স ব্রিগেড (ভারত)

২নং পশ্চিমবঙ্গ শাখা

স্বামী সুবীর বাবু কনট্রাকটারী করেন। তিন মেয়ে। দুই মেয়ে কলেজে পড়ে আর একটি স্কুলে। সুবীর বাবুরও কোন ছেলে নেই। এতদিন ধরে বেশ ভালই উপায় করছিলেন। তবে আয়ও যেমন ছিল ব্যয়ও তেমন করতে কার্পণ্য করতেন না। খুব সৌখিন লোক সুবীর বাবু। বছর তিনেক আগে সবাইকে নিয়ে প্রায় সারা ভারত পরিদর্শন করে এসেছিলেন। সেই সময়ে হরিদ্বারে যাবার ইচ্ছে থাকলেও কোন কারণে আর যেতে পারেন নি। এর জন্য স্ত্রীর কাছে কথাও শুনতে হয়েছিল তাঁকে। ললনা খুব দুঃখ করে বাবাকে এর জন্য চিঠি দিয়েছিল। তিনি যেন কিছু মনে না করেন।

চিঠির উত্তরে নবকান্ত বাবু লিখেছিলেন 'এর জন্য দুঃখ করিও না, তোমরা সুখে থাকলেই আমি সুখি হব।' টেলিগ্রামটা পেয়ে ললনা মাথায় হাত দিয়ে বসল। বাড়ীতে ত কেউ নেই। সুবীর বাবু বিশেষ কাজে আসামের বাইরে গেছেন আজ নিয়ে ঠিক তিন দিন হোল। কাজকর্ম্ম এখানে তেমন ভাল চলছে না। এখানে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে ভবিষ্যতে হয়ত থাকাই চলবে না। অথচ তিন পুরুষের বাস সুধীর বাবুদের। তাই সুধীর বাবু গেছেন মধ্যপ্রদেশে কেন একটা জায়গায়। ওখানে একটা কিছু সুবিধামত করতে পারলেই সবাইকে সেখানে নিয়ে যাবেন এই আশায়।

তাই ললনা টেলিগ্রামটা পেয়ে মাথায় হাত দিয়ে ভাবছে। এ অবস্থায় সে কি আর করতে পারে? অথচ বাবার এইরকম অবস্থায় একবার যাওয়া দরকার। না গেলে লোকেই বা কি বলবে? লোকে বলবে বাবার বিষয় সম্পত্তির উপরই নজর শুধু, তাঁকে শেষ দেখাও দেখতে এল না। আর এই অসময়ে বাবার সম্পত্তি ত বিপদ থেকে উদ্ধার করবে তাদের। কিন্তু যাব বললেই ত যাওয়া যায় না। হাতে টাকা

পয়সাও তেমন নেই। অনেক ভেবে চিন্তে গলার হারটা বেচে দিল ললনা। হিসাব করে কিছু টাকা সুবীর বাবু সংসারের খরচের জন্য দিয়ে গেছেন তাতে ত এতটা পথ যেতে খরচে কুলোবে না। মেয়ে তিনটেকে রেখেও যাওয়া চলে না। যা দিন কাল পড়েছে আজকাল। হারটা বিক্রী করতে প্রথমটা একটু কষ্ট হয়ে ছিল ললনার। বিয়ের হার।

স্বামীকে সব খুলে চিঠিতে লিখে দিল। চিঠি পাওয়া মাত্র যেন হরিদ্বারে চলে যেও। আমরা কাল রওনা হচ্ছি।

সস্ত্রীক হরবিলাস বাবু হরিদ্বারে পৌঁছুলেন সর্ব প্রথম। তখনও অন্য দুই ভায়রাভাই এসে পৌছুতে পারে নি।

নবকান্ত বাবুর অন্তিম অবস্থা। ঘর ভর্তি সাধু সন্ন্যাসীর দল। নবকান্ত বাবুকে মন্ত্রের শেষ হরিনাম শোনাচ্ছে। কেউ বা মুখে মাঝে মাঝে গঙ্গা জল ঢেলে দিচ্ছে। নবকান্ত বাবুর তখন ক্ষীণ জ্ঞান রয়েছে।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

বিশেষ কারণ বশতঃ এই সংখ্যায় 'চন্দনপুরের ভূত' নামক ভৌতিক গল্পটি প্রকাশ করা সম্ভব হইল না।

পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি

এ সংখ্যায় কোন লেখা এবং কোন ছবি আপনার সব চেয়ে বেশি ভালো লেগেছে জানলে সুখী হবো।

নিয়মিত ভাবে সচিত্র ভারত পেতে হলে বাঁধা গ্রাহক হওয়াই সুবিধা।

সডাক চাঁদা— { বার্ষিক—বারো টাকা। ষাম্মাসিক—সাড়ে ছ' টাকা।

ম্যানেজার
সাচিত্র ভারত।

পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে চলিতেছে—

সায়রা বানু
বলরাজ সাহানী
মনোজ
ইন্দ্রানী
গুমপ্রকাশ

অভিনীত

বাহার ফিল্মসের

শাদী

হিন্দ ঃ কৃষ্ণা
খান্না ঃ প্রিয়া
ও শহরতলীর বিশিষ্ট
চিত্রগৃহে

এবছর ফুটবল ক্রীড়ামোদীদের কাছে সব চাইতে আশাপ্রদ ও আনন্দের সংবাদ হচ্ছে আই এফ এর সভাপতি পদে শ্রী অতুল্য ঘোষের নির্বাচন। ষ্টেডিয়ামের স্বপ্ন চোখে নিয়ে বছরের পর বছর যে সব হাজার হাজার দর্শক জল কাদা ভেঙে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ময়দানের ঘেরা মাঠের বেড়ার বাইরে অথবা র‍্যামপার্টে দাঁড়িয়ে এসেছেন এতদিন, এ খবর তাঁদের কাছে অনেক আশা বয়ে নিয়ে এসেছে। হয়ত এ দুর্ভোগ আর বেশীদিন নেই। হয়ত ষ্টেডিয়াম দেখে যেতে পারব। এই আশা নিয়ে তাঁরা তাঁদের নব নির্বাচিত সভাপতিকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

●

গত ২৪শে মার্চ বিশ্ব ওয়েল্টার ওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ চ্যাম্পিয়ান শিপের লড়াই চলবার সময় ভূতপূর্ব্ব চ্যাম্পিয়ান বেনি প্যারেট তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী এনিল প্রিফিথের মুষ্ঠাঘাতের ফলে মারা যান। এখবর হয়ত প্রায় সকলেই পড়েছেন এবং আঁৎকে উঠেছেন।

আঁৎকে উঠেছি আমরাও। ভাবুন ত, কী বিভৎস ব্যপার। দুটো লোককে পরস্পর লড়িয়ে দেয়া হয়েছে। দু'জনেই দুজনের নাকে, মুখে, বুকে এবং যেখানেই ফাঁক পাচ্ছে প্রচণ্ড জোরে ঘুষি চালাচ্ছে। সে ঘুষির একটি খেলেই হয়ত আমাদের দেহটিকে ছেড়ে

প্রাণপাখি জান নিয়ে পালাত। ওঁরা বলবান। কাজেই বেশ কিছু ঘুষি খেয়ে হয়ত হজম করে ফেলছেন। কিন্তু কতক্ষণ হজম করবেন ২ এক জন উত্থানশক্তি রহিত হয়ে ধরাশায়ী না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চলছে। এযেন সেই দাসপ্রথার আমলের দুই গ্ল্যাডিয়েটারের লড়াই; একজন খতম না হওয়া পর্যন্ত চলবে। অথবা যেন বুল ফাইট। যারা লড়াই করছে তাদের জান নিতে টানাটানি আর যারা দেখছে তাদের কী পৈশাচিক উল্লাস। বিংশ শতাব্দীতে বসে সেই উল্লাশ উপভোগ করছি আমরা, একথা ভাবতেও লজ্জা বোধ হচ্ছে।

হয়ত অনেকে চলবেন, খেলা খেলাই। সেখানে খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি বজায় রেখে চলা উচিত। তাই বলে সেই খেলাটাই বন্ধ করে দেয়া কোন কাজের কথা নয়।

কথাটা ঠিক। তবে কথা হচ্ছে যেখানে খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি বজায় রাখতে হবে, সেটা আদৌ খেলা কিনা। ফুটবল, ক্রিকেট হকি, টেবিল টেনিস, সবই ত খেলা। কিন্তু এদের কোনটাতে খেলোয়াড়ের নাকে মুখে আঘাত করবার রীতি আছে বলুন? জুয়া খেলাও ত খেলা। কিন্তু তাকে কি সুস্থ খেলার জাতে তুলে নেবেন আপনারা? তেমনি যে খেলায় খেলোয়াড়কে আঘাত করাটাই রীতি, যে খেলায় রক্তারক্তি অবধারিত, এবং যে খেলায় খেলোয়াড়ের প্রাণ নিয়ে টানাটানি, তাকে কি সুস্থ খেলার জাতে জায়গা দেয়া যায়?

তা যে যায়না, যুক্তরাষ্ট্রের লেডি সামারস্কিল মুষ্টিযুদ্ধের বিরোধিতা করে তার প্রামাণ দিয়েছেন। এমন কি যুক্তরাজ্যে পেশাদারী বক্সিং নিষিদ্ধকরণ বিলের প্রথম দফার আলোচনা হাউস অব লর্ডসে সম্প্রতি হয়ে গেছে এবং কয়েকদিনের মধ্যেই ব্যারোনিস

সামারস্কিল কর্তৃক উত্থাপিত বিলের ওপর হাউস অব লর্ডসে বিতর্ক সুরু হবার কথা আছে।

অবশ্যই ব্রিটেনের কিছু লোক এবং অধিকাংশ চিকিৎসক এই বিলের বিরোধিতা করছেন। আমাদের মনে হয় তাঁরা পৈশাচিক উল্লাসের লোভ সামলাতে পারছেন না। নইলে যেখানে মানুষের জীবন নিয়ে খেলা, সে খেলায় কোন সুস্থ বিবেক সম্পন্ন লোক সায় দিতে পারে না। এই বিভৎস মুষ্টিযুদ্ধ অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার বলেই আমরা মনে করি।

মুক্তি প্রাপ্ত 'কান্না' চিত্রে উত্তম কুমার [জন] এবং নন্দিতা বসু [লেনা]

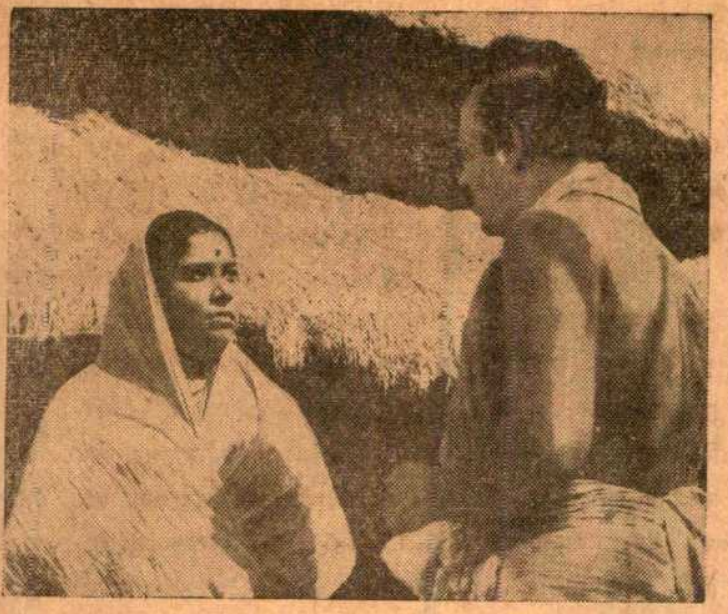

তারাশঙ্কর রচিত 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' চিত্রে বনোয়ারী—কালী ব্যানার্জী এবং কালো বৌ—অনুভা গুপ্তা।

তাঁর বৌ কালোশশীর সঙ্গে বানোয়ারীর রঙ। পরম কি ছেড়ে দেবে বানোয়ারীকে না হেঁপোরুগী নয়ান ছেড়ে দেবে করালীকে, যে তার কচি বৌ পাখীকে কেড়ে নিয়ে গেছে? এখানেও সংঘাত সেই আদিম নারীকেন্দ্রীক সংঘাত।

সব সংঘাত কিন্তু কি করে যেন ভেসে গেল কোপাই-য়ের বানে। বাঁশবাদীর বাঁশঝাড় কেটে মিলিটারীরা শ্মশান করে দিল, বানোয়ারী সহ্য করতে পারল না সে আঘাত। কোপাইয়ের দিকে চোখ রেখে সে এক সময় পালিয়ে বাঁচল। কিন্তু বানোয়ারী বাঁচলেও করালীও আছে, গাঁ-ছাড়া মানুষগুলোকে করালীই আবার গ্রামে ফিরিয়ে আনতে পারবে না?

'ক্ষণিকের অতিথি' ছাড়া তপন সিংহের আর যে কটি ছবি আমি দেখেছি তাদের মধ্যে মননের অঙ্ক একেবারেই শূণ্য বলে মনে হয়েছে।

সাধারণ সংযম ও সংবেদনার সঙ্গে পায়িত, দৃশ্যগুলি দেখতে দেখতে ংগ শিহরিত হয়েছে। চোখে জল সেছে আর বাউরীদের নাচের ালে তালে মন দুলে উঠেছে।

একবার একটা কথা শুনে-ছিলাম। ত্রুটি না থাকলে শিল্প সৃষ্টি ার্থক হয় না। তাই বোধহয় কয়েকটি জায়গায় ত্রুটি নজরে পড়ল, গোড়ার দিকে 'জুম্' লেন্সের অকারণ ব্যবহার দু-একটি ক্ষেত্রে পীড়াদায়ক, বিশেষ করে বানোয়ারীর ঘাটে হাত মুখ ধোওয়ার দৃশ্যে তার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। তাছাড়া 'ফ্লাস্ক' এর ব্যবহার যে সব ক্ষেত্রে কল্পনার সহায়ক হতে পারত এমন ক্ষেত্রে 'কাট' এর ব্যবহার রূঢ় বলে ত হয়েছে। তথ্য চিত্রের পক্ষে মা শোভনীয় কাহিনী চিত্রের ক্ষেত্রে তা রসহানির কারণ বলে মনে হয়। কয়েকটি দৃশ্যের কৃত্তিমতাও চোখে লাগে যেমন—করালীর ঘরের উড়ে যাওয়ার পরে 'ফ্লোর' অথবা 'সেট'এর অংশ বিশেষ চোখে পড়ে এবং বনের মধ্যে বৃষ্টি দৃশ্যে—কয়েক জায়গায় আওয়াজ প্রচুর কিন্তু বৃষ্টি নেই অথবা দেখা যায়নি। এইরূপ আরও কয়েকটি দৃশ্যে পরিচালক সতর্কতা অবলম্বন করতে পারতেন। আরও একটি কথা, দেখানে হ'লবানের ভয়ে গ্রামবাসীরা পালিয়ে গেছে, তারপর বন্যার রুদ্ররূপ, কিন্তু তেতাল্লিশের সেই প্রচণ্ড প্লাবন অসুস্থ বানোয়ারীর বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারল না।

অভিনয় সম্পদের দিক থেকে 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা বহুদিন মনে থাকবে। বানোয়ারীর রূপে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় অনন্য। মনে হয় এ চরিত্রের রূপায়ণ আর কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি কখনও গ্রামের মাতব্বর কখনও পরকীয়া নিমগ্ন বেদনা জর্জর প্রেমিক, কখনও ক্রুদ্ধ অভিভাবক অথচ কোথাও আতিশয্য নেই, কৃত্তিমতা নেই আড়ষ্টতা নেই। দিলীপ রায়ের করালী ও তাই—স্বচ্ছ এবং স্বাভাবিক। বিশেষ করে করালীর উদ্ধত ভাবটি তার অভিনয়ে মূর্ত্ত। রবি ঘোষের পানু আকর্ষণীয় চরিত্র সৃষ্টি। সুচাঁদ পিসী যেন গ্রীক নাটকের কোরাস্ শুধু তাদের মত নিষ্প্রান নয় বরং বলা যায় সে যেন এক সজীব সংস্কারের প্রেত নিভাননী যার আত্মা। কালো বৌয়ের ভূমিকায় অনুভা গুপ্তা অনেক দিয়েছেন এবং

আরো দিতে পারতেন হয়তো, 'কবি'র ঠাকুরঝির চেয়েও বেশী কিন্তু চিত্রনাট্যকার তপন সিংহ চরিত্রটির প্রতি সুবিচার করেননি। নসুবালার চপলতা লিলি চক্রবর্ত্তী সুন্দরভাবে ফুটিয়েছেন কিন্তু পাখীর ভূমিকায় রঞ্জনা সে তুলনায় কয়েকটি ক্ষেত্রে নিষ্প্রভ. ঝড়ের রাতে তাঁর দৃষ্টি ইংগিতময়তার প্রতীক। এছাড়া প্রশান্ত কুমার, দেবী নিয়োগী, চন্দন রায়, বীরেশ্বর সেন, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্য প্রতিটি শিল্পী স্ব স্ব ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় করেছেন। উল্লেখযোগ্য ছোট ছোট বহু ভূমিকাতেই যে সব শিল্পীরা দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁদের অনেকেই চলচ্চিত্রে আগন্তুক।

'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' ছবিটিতে বেশ বড় গান আছে। গানগুলি সবই সুপ্রযোজ্য। গানের জন্য কোথাও নাটক হোঁচট যায়নি। গানগুলির মধ্যে পাঁচটি রচনা করেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু একটি সর্বজন পরিচিত গান (কে বিদেশী মন উদাসী) যা রচনা করেছেন কাজী নজরুল, কিন্তু দুঃখের কথা তাঁর নাম কোথাও স্বীকার করা হয়নি। ছবির আবহসংগীত এবং কণ্ঠসংগীত দুই উপভোগ্য ও নাটকের পরিবেশ রচনায় সহায়ক হয়েছে। ছবির সার্থকতার মূলে আর যে একজন শিল্পী প্রশংসা পাওয়ার বিপুল দাবী রাখেন তিনি হলেন চিত্রধর বিমল মুখার্জী।

সম্পাদক :
শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

সহঃ সম্পাদক :
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথসেনগুপ্ত

৮৬, বর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ (ফোন : ২৪-৫৭৬৯) হইতে শ্রীমাণিকলাল সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও সান সাইন প্রেস ৫৯, মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য—১২৲ টাকা (সডাক), ষান্মাসিক মূল্য—৬।০ টাকা (সডাক)

লাইফবয় মেখে স্নান করলে শরীরটা তাজা আর স্বাস্থ্যে ভরে হবে! প্রতিদিন ধুলো ময়লা গায়ে লাগবেই—লাইফবয় সেই ধুলো ময়লার বোঝা বীজাণু ধুয়ে দেয়। আপনি ও পরিবারের সেই স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য রোজ লাইফবয় মেখে স্নান করুন।

ফবয় যেখানে, স্বাস্থ্যও সেখানে!

তরী

L 30-X29 BG

MENDED-2008

Reg. (No. C. 3737) Sachitra Bharat.

To secure the nation's

Built conservatively on firm foundatio
nearly two centuries ago, our Organisati
past has served India well and is currently m
contributions to the present economy. We a
our resources to meet the country's future nee
structural and mechanical engineering, railway wa
cranes, electricity, light railways, building a

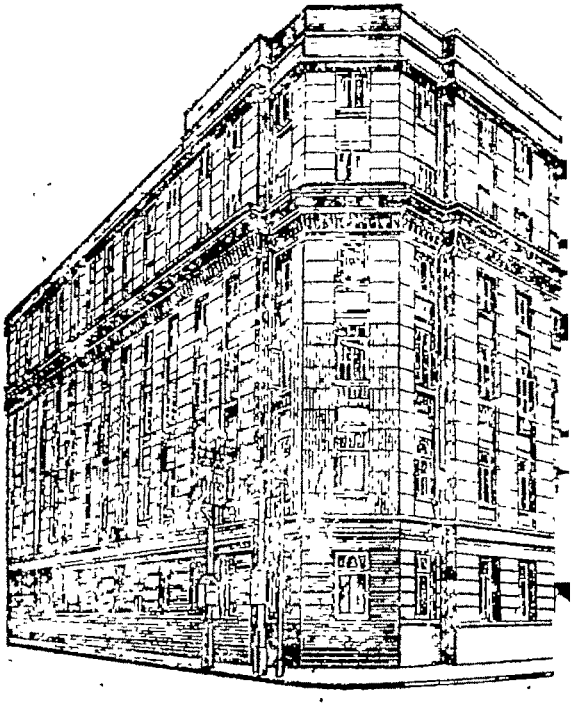

MARTIN BURN LIM

Managing Agents, Secretaries and Treasure

HEAD OFFICE : MARTIN BURN HOUSE, 12, MISSION ROW,

BRANCHES :

NEW DELHI : Pearey Lal Building, 40-42 Janpath, New D
BOMABY : Esplanade House, Waudby Road, Bombay
KANPUR : Westcott Building, The Mall, Kanpur 1,
PATNA : 19, Museum Road, Patna 1, Post Bo
LONDON OFFICE : Martin Burn House, 12 Austin Friar